Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 206 – 211
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরীর ছোটগল্প : বরাক উপত্যকার মুসলিম সমাজ ও নারীর অন্তঃস্বর

দিলদার কিবরিয়া
গবেষক ও প্রাবন্ধিক
বেলঘরিয়া, কলকাতা
ইমেইল : dildar.kbr@gmail.com

Keyword
মুসলমান সমাজ, নারী, সাধারণ নিরন্ন মানুষ, প্রতিবাদ, বরাক।

Abstract
বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরী একজন দায়বদ্ধ লেখক। উত্তর-পূর্বের নানা ভাষাভাষী মানুষের বিশেষ করে বাঙালি সমাজের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অস্তিত্ব-সংকট, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, সংগ্রাম, জয়-পরাজয় যাপিত জীবনই বদ্‌রুজ্জামানের গল্পের প্রধান ও নির্ভরযোগ্য বীজখেত। মুসলমান সমাজে যাপন কথা এই অঞ্চলের প্রায় গল্পকারদের কলমে উহ্য থাকলেও বদ্‌রুজ্জামান ওই ফাঁকটুকু ভরাট করেছেন। ওই সমাজের একজন অংশীদার ও মগ্ন পর্যবেক্ষক হিসেবে তাঁর গল্পে স্বতঃস্ফূর্ত উঠে এসেছে বরাক উপত্যকার মুসলমান সমাজের সাধারণ মানুষের কথা।

Discussion
একটি সমাজের চিত্র খুব ভালোভাবে ফুটে উঠে সেই সমাজের সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনের উপরেই। বদ্‌রুজ্জামানও তাঁর গল্পগুলিতে তুলে ধরেছেন বরাকের সাধারণ শ্রেণীর মানুষ, সমাজ গর্হিত কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ ও প্রতিবাদের চিত্র। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় পেশাগতভাবে তাঁর গল্পের মানুষেরা কেউ রিক্সাচালক, কেউ স্কুলের শিক্ষক, কেউ দিনমজুর, কেউ দরিদ্র কৃষক। কিন্তু সামাজিক স্তর ক্রমশ ঠেকিয়ে রাখতে পারেনা মানবিক অনুভূতিকে। অনুভূতির সত্যে মানুষ সর্বদা একই রকম তা বদ্‌রুজ্জামানের গল্পের মধ্যে বোঝা যায়।

বদ্‌রুজ্জামানের লেখা **'জানোয়ার'** গল্পটি একটি নির্মম বাস্তবের চিত্ররূপ। নিঃস্ব, অসহায়, অভাব, দৈন্যতা যে কত অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে তা এই গল্পের আছিম ও তার পরিবারের জীর্ণ দশা দেখলে চমকে যেতে হয়।

আছিম একজন রিকশাচালক। সারাটা দিন রিকশা টেনে সামান্য কিছু পারিশ্রমিক পায়। কেননা উপার্জনের সিংহভাগই রিকশার মালিককে দিতে হয়। কোনোরকমে কায়ক্লেশে সংসারের জমাট বাঁধা অভাবের অন্ধকার দূর করতে আছিমের কালঘাম ছোটে। শত চেষ্টা, শত স্বপ্নের মাঝে আছিম তার পরিবারের মুখে স্নেহের অন্ন তুলে দিতে চায়, চায়

রোগজীর্ণ শিশুপুত্র বাদশার রোগমুক্ত করতে। কিন্তু হায়! নইমুদ্দিনের মতো অসাধু রক্তচোষার কাছে আছিমের শত প্রচেষ্টা দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যায়। বাদশা সামান্য খাবার ও উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অকালে প্রাণ হারায়।

লেখক এই রোগজীর্ণ বাদশার মৃত্যুর মাধ্যমে সমাজের চিরকালীন ব্যাধিগুলোকে তুলে ধরেছেন। এই প্রতীকী মৃত্যু সমাজের অর্থনীতির অসম বন্টন ও পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ,

> "...শুধু চোখ দুটো মেলে মা'র দিকে তাকিয়ে ঠোঁট ভেঙে একটু হাসল। ক্ষুধার্ত রোগজর্জর শিশুটার মুখে কিসের হাসি কে জানে...।"[১]

নিঃসন্দেহে শিশুটির মৃত্যুর প্রাক্ মুহূর্তে এই বাঁকা হাসি সমাজস্থ কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষরূপী জানোয়ারদের আসল চেহারার অলিখিত ব্যঙ্গের হাসি, যা নইমুদ্দীনের মতো জানোয়ারকে আমরা সহজে অসহায় দরিদ্র মানুষদের রক্তচোষা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে সমাজের এই দশা ও জীর্ণতাকে নিরীক্ষণ করেছেন এবং চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন আজও কত মানুষ নররূপী পিশাচদের কবলে পড়ে সর্বস্ব হারাচ্ছে।

'মানুষ' গল্পটির মর্মান্তিক কাহিনি আমাদেরই সমাজের মুখোশ খুলে দেয়। বরাকের দরিদ্র মুসলমান জীবনের যন্ত্রণাদীর্ণ ছবি শ্লেষের সাহায্যে বহুঃস্বর নিয়ে উঠে আসে বদ্‌রুজ্জামানের হাত ধরে। 'মানুষ' গল্পটির প্রধান চরিত্র রাজ্জাক মিঞা। রাজ্জাক ও তার পরিবারকে কেন্দ্র করেই গল্পকার গল্পটির কাহিনি অঙ্কন করেছেন। গল্পে দেখা যায় রাজ্জাক আগে রিকশা চালাত। কিন্তু তার অসুখ করায় সে আর আগের মতো রিকশা চালাতে পারে না। ঘরে তার স্ত্রী পাতাবিবিসহ চারজন ছেলে মেয়ে। পাতাবিবির ছেলেটির অনেকদিন ধরেই জ্বর। তাই রাজ্জাককে পাতাবিবিকে বলতে দেখা যায়,

> 'খাবে কী? ...তোর বুকে কিছু আছে না নাকি? ভাত খেয়েছিস?'[২]

কিন্তু অভাবের সংসারে বাচ্চাদের মুখে কিছু না দিয়ে পাতা কি কিছু খেতে পারে? ঘরে সামান্য ভাতের ফ্যান যা থাকে তা তো ছেলে মেয়েদের মুখে তুলে দিয়ে ভিক্ষা করতে পাঠানো হয়। অসুস্থ রাজ্জাককে আধপোড়া বিড়ি চুলোর আগুনে ধরাতে দেখে পাতাবিবি যখন রাজ্জাককে বিড়ি না খাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। তখন রাজ্জাক বলে উঠে,

> 'পারবোনা কেন? ভাত না খেয়ে যখন পাড়ি, ধোঁয়া না গিলেও পারবো। তবে নেশা বড়ো হারামি কিনা। তুই যেরকম বাচ্চা পেটে এলে চুলোর পোড়া মাটি না খেয়ে পারিস না।'[৩]

এখানে সমাজের একটি কঠোর সত্যরূপ ধরা পড়ে যে পেটে ভাত না থাকলে একটা মানুষের কিছু করার থাকেনা ভাতের তাগিদে পোড়া মাটি খেয়েও বাঁচার লড়াই করতে হয়।

গল্পে আর একটি দিক পরিলক্ষিত হয় যে পাতাবিবির কোলের বাচ্চাটি গায়ের গন্ধ যখন রাজ্জাকের নাকে লাগে। তখন রাজ্জাক পাতাবিবিকে বাচ্চাটির কাপড় বদলানোর জন্য বললে পাতাবিবি ছেলেটির কাপড় বদলাতে পারেনা। কারণ অভাবের সংসারে আহার যোগাড়ই অনেক কষ্টকর, উপরন্তু কাপড় কেনার টাকা যোগাড় হবে কোথা থেকে? পাতাবিবির কথায় রাজ্জাকের মনে হয় ওটা যেন মানুষের বাচ্চা না। পাতাবিবি বলে ওঠে,

> 'মানুষ?...বাচ্চাটার সকাল থেকে একদম চুপ। শুধু শ্বাস ফেলছে এই যা। অসুধপত্র কিছু করানো হয়নি, করানো সম্ভব নয়। তিনটে বাচ্চা ভিক্ষে করতে বাইরে গেছে, চতুর্থটা মরে গিয়েছে। এই পঞ্চমটা হয়তো যাবে। কুড়ি দিনের পোয়াতি বিবিকেও প্রায়দিন উপোস দিতে হয়। বাচ্চাটা এখন 'মাই' টানতে চায় না। পেট ভর্তি জল থাকলে বুকে রস আসে কোথা থেকে?'[৪]

গল্পটিতে দেখা যায় অনাবৃষ্টির ফলে মাঠ শুকিয়েছে তাই বাচ্চাগুলো প্রায় দিনই খালি হাতে ফিরে আসে, কে কাকে খেতে দেবে গ্রামের সব মানুষগুলোরই প্রায় একই অবস্থা। পাতাবিবির মেয়েটা একটা ডিম নিয়ে ফিরেছিল তিন

ভাই বোন ভাগ করে খাবে বলে। পাতাবিবি ডিমটি বিক্রি করে ছোটো বাচ্চাটার মুখে সামান্য চিনির জল দেয়। ছ' বছরের ছেলেটি প্রতিবাদ করে,

> '...তুমি ওটা বিক্রি করে কেন ওর জন্য চিনি আনবে? আমাদের ভুখ নেই।'[৫]

গল্পে আর একটি দিক লক্ষ করলে দেখা যায়, আমাদের সমাজে গরিবদের সত্যটাও কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু যাদের কাছে টাকার জোর আছে তাদের মিথ্যেটাও সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়। তাই তো গল্পে মুর্গীর বাচ্চা শিয়াল তুলে নিয়ে গেলে শুনেও চৌধুরী বুড়ি পাতাবিবির কথা বিশ্বাস করলো না, তাকে চোর অপবাদ দিল। চোর অপবাদ দেওয়ার কারণ হয়তো পাতাবিবি গরিব বলে। কিন্তু এদিকে গ্রামের চৌধুরী সাহেব রাকেশ দাসকের পাঁচশো টাকা দিয়ে জমি রেজিস্ট্রি করিয়ে বাকি টাকা ঘরে এসে দেবে বলে দিল না। এই কথা সমাজে কেউ সত্যটা জেনেও কানে তুলল না। এটাই আমাদের সমাজ। চুরির অপবাদে রাগ হয়েছিল। কিন্তু সে রাগ প্রকাশ করলেই বিপদ।

গল্পের সমাপ্তিতে গল্পকার আমাদের চোখে সমাজের নির্মম একটা ছবি তুলে ধরেন, যখন দেখি বাড়ির পেছনে একটা মস্ত মাঠে শকুন ও কুকুরের চিৎকার শুনে রাজ্জাক এগিয়ে যায়। রাজ্জাক গিয়ে দেখে মাঠে মরা গরুর কাছে তার ছেলে মেয়েগুলো। রাজ্জাকের চোখে পড়ে তিন বছরের বাচ্চাটা মুখ বন্ধ করে রয়েছে তখন মেয়েটা বলে তাদের খুব খিদে পেয়েছে।

> 'শক্ত হাতের চড় খেয়ে ছেলেটা চিৎকার করে কেঁদে উঠে। মুখ থেকে খসে পড়ে একটুরো মাংস।'[৬]

গল্পের শেষে,

> 'শক্ত হাতের চড় বস্তুত মধ্যবিত্তদের জগতের ওপর এসে পড়ে। ক্ষুধার জ্বালায় শিশুরাও শকুন তাড়িয়ে মরা গরুর মাংস মুখে পুরে, সভ্যতার ইমারতে লুকিয়ে থাকে অন্ধকার এবং ক্ষুধার চেয়ে অশ্লীলতার বর্বরতা কিছুই নেই এই দুনিয়ায়।'[৭]

'পরবাস'-এ নিরলম্বতার দৃষ্টান্ত আরো জোরালো। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের চরম দুর্দশার কথা লেখক দরদভরে লিখেছেন। এই দুঃখ কবলিত মানুষদের আত্মিক কথ-কথার যে নিরঙ্কুশ চিত্রধারা, যেখানে গল্পের ফানুসের মতো ফাঁপা নয়, এর সত্যতা অতীব দৃষ্টান্তমূলক এবং বাস্তবসম্মত।

গল্পের জয়নাব কেবল গল্পের চরিত্র হিসেবে নয় – তৎকালীন ও এ সময় ধারা পর্যন্ত মুসলিম শরিয়তি শাসন ব্যবস্থার এক নির্ভেজাল সাক্ষীস্বরূপ। তালাকের মতো একটি অভিশপ্ত সিস্টেমে পড়ে জয়নাবের মতো নারীসমাজকে বিধ্বস্ত হতে হয়েছে। কুপ্রথার এই বহুমুখী আস্ফালন নারীকুল বিগত থেকে বর্তমান এবং আগত কাল পর্যন্ত ক্ষয় হতে থাকবে। এর জন্য দায়ী একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষা ও পারিশ্রমিক সাম্যতার বিভাজন।

শফিক চাইছে সারাদিন রিকশা টানার পর যাতে সন্ধ্যেবেলায় দুমুঠো ভাত জয়নাবের হাৎ থেকে পায়। কিন্তু সংকট তো কোনো কালেই ঘোঁচে না। পরিশ্রমী মানুষের স্বাভাবিক ভাবেই তার উপযুক্ত আহারের প্রয়োজন। নিজের অক্ষমতার দরুণ প্রয়োজনীয় সেই আহারটুকু যদি না জোটে সেখানেই তো সমস্ত রোষ গিয়ে পড়ে গৃহিণীর উপর। গৃহিণী বেচারা নিরুপায় হয়ে স্বামীর সমস্ত রাগের শিকার হয়। পুরুষ তার সমস্ত রোষের তাপমাত্রা ছড়ায় নারীর ওপর,

> '...একটা লাঠি জোগাড় করে নিয়ে রাগ না মেটা পর্যন্ত শফিক স্ত্রীকে পিটিয়েছিল, তারপর দু' তিনটে লাথি কষে দিয়ে বলল, যে তরে আমি তালাক দিলাম। এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক। যা হারাজাদি, এখন থাকি তুইন আমার লাগি হারাম অই গেলি।'[৮]

এই ক'টা গর্হিত শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে নারী তার সমস্ত অধিকার থেকে নিমিশে বঞ্চিত হয়ে যায়। সমাজের এই ঠুনকো ব্যবস্থাপনায় নারী পদে পদে নিষ্পেষিত হচ্ছে, অত্যাচারিত হচ্ছে। এই অত্যাচারের কোনো সীমা নেই, নেই কোনো নির্ঘন্ট। এই পুরুষপ্রধান শাসন ব্যবস্থায় যেকোনো সময়, যেকোনো পরিস্থিতিতে নারীর সম্মানের

আব্রু ঘুঁচে যেতে পারে। যেরকমটা হয়েছে জয়নাবের সাথেও। তালাকের পর জয়নাব তার ভাই বশিরুদ্দীনের বাড়ি থাকত। কিন্তু দু'মাস নিজের আশ্রয়ে রেখে একরাত্রে বশিরুদ্দীন তার নিজের ভাতের থালাটি জয়নাবকে দিয়ে বলেছিল,

> 'আমি আর পারিয়ার না। তর্ একটা ভালা বিয়ার মাত আইছে। আমি তরে না জিগাইয়া কথা দিয়া ফেলাইছি।'[৯]

জয়নাবের ভাই জয়নাবের বিয়ে গ্রামের ধনীলোক সত্তর বছরের হাজি শরাফতুল্লাহার সাথে ঠিক করার আগে জয়নাবকে জিজ্ঞেস করেনি আর জয়নাবের স্বামী শফিক তিন তালাক দেওয়ার আগে জয়নাবকে জিজ্ঞেস করেনি। তাই তার ঠাঁইও হয়েছে আর একজন পুরুষমালিকের খাঁচায়। যেখানে জয়নাবকে শকুনের মতো খুবলে খুবলে খেয়েছে এই অনিশ্চিত পুরুষমালিক। এভাবে তাকে লাঞ্ছিত, অপমানিত হতে হয়েছে দিনে দিনে। তার যে একটি ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকতে পারে, নিজস্ব রুচি-অভিরুচি থাকতে পারে সেটির কোনো মূল্যই দিতে চায়নি শফিক ও হাজি শরাফতুল্লাহার মতো পুরুষ সমাজ। কেবলি নিজেদের দুর্বলতা ঢাকবার জন্য নারীকে করেছে কোণঠাসা।

'অশ্লীল' গল্পটিতে লেখক নারী সমাজকে কীভাবে পুরুষতন্ত্র শরিয়তি শাসনের নাম করে অপমান করছে, তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নারীকুলকে বঞ্চিত ও অন্ধকূপে ঢেলে দিতে পুরুষ সমাজ বিন্দুমাত্র কার্পণ্যতা করেনি। একটি অশ্লীল জানোয়ারকে চিহ্নিত করবার জন্যে লেখক সুমিষ্ট বর্ণনার বসবর্তী হয়েছেন। লেখকের তীক্ষ্ণ তির্যক কলমে সমাজস্থ বসবাসকারী সার্থান্বেষী, সুযোগসন্ধানী এবং বর্ণচোরা মানুষদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

'অশ্লীল' গল্পটি একটি সমাজের ঘুণধরা ও ধর্মীয় শাসনের দোহায় দিয়ে নারীকুলকে চরমভাবে বিধ্বস্ত করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। পারুল তার সংসার নিয়ে একলাছ আলির সাথে ছোটোখাটো অভাব অনটনের মধ্যে দিয়েও একটি নড়বড়ে গৃহস্থালি জীবন অতিবাহিত করত। সংসারের রাগ, অভিমান, উচ্চাকাঙ্ক্ষা একটি সাধারণ যুগলবন্দী দম্পতির সরল যাপনের স্বপ্ন। এরই মাঝে এই সাধারণ খেঁটে খাওয়া পরিবারের 'স্বচ্ছলতা' যখন শত্রু হয়ে উঠে তখন আর ধৈর্যের বাঁধ থাকেনা। সনাতনী পুরুষতন্ত্রের আসল রূপ বেরিয়ে আসে এই দুর্বলের উপর আঘাত করে। ঠিক তেমনি, এখলাছের সমস্ত রোষ উপচে পড়ে পারুলের ওপরে। নির্মমভাবে পুরুষ তখন নারীকে আঘাত করে। এই শরিয়তি শাসনকে পুরুষরা নিজেদের পৌরষত্ব জিইয়ে রাখবার জন্য একমাত্র অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করে।

একলাছ তালাক নামক এই গর্হিত শাসন ব্যবস্থার মদতে পারুলকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়,

> 'হঠাৎ একদিন সামান্য একটা কথা নিয়ে রাগারাগি করে স্ত্রীকে সাফ তিন তালাক দিয়ে বসল এখলাছ...।'[১০]

এই যে নিয়ম এই যে অন্ধকূপমন্ডতা কেবল নারীদেরকে বেঁধে রাখার জন্যই তৈরি? কেবলই কি তাদের পায়ে পায়ে বেঁধে রাখবার প্রচেষ্টা? এই যে একলাছ তালাক নামক শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে তার নিজ স্ত্রী অচেনা হয়ে যায়। এই যে সিস্টেমের অভিশাপ; এর থেকে মুক্ত হতে গেলে প্রায়শ্চিত্ত কেবল নারীকেই করতে হচ্ছে বিনা অপরাধে। পুরুষ তো তার নিজের অহংবোধ নিয়ে নারীর ওপর ছড়ি ঘোরায়। পারুলের ক্ষেত্রে তাইই হয়েছে। পারুলকে পুনরায় এখলাছের কাছে আসতে হলে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিতে হবে। সেই ব্যক্তি অন্তত একরাত সহবাসে রাখার পর পারুলকে তালাক দেবে। এর পরেই পারুল এখলাছের কাছে ফিরতে পারবে।

বদ্‌রুজ্জামান-সমীক্ষায় **'আমরা সবাই ভালো আছি'** বলে একটি উচ্চ মানের গল্প পাই। ঠিক গল্প নয়, সমাজস্থ মানুষের একে অপরের সম্পর্কের চিন্তা-চেতনার এক সূক্ষ্ম উপলব্ধি। বিশেষ করে নারীদের প্রতি যে পুরুষসমাজের উদাসীন মনোভাব তারই একটি প্রামাণ্য চিত্র এই গল্প। গল্পের বানু এই প্রামাণ্য চিত্রের ফলক। যাকে কেন্দ্র করেই প্লটের গতিধারা বয়েছে।

লেখক এক অভিনব পদ্ধতিতে উত্তর আধুনিক সমাজের বাস্তব সত্যকে গল্পে বুনেছেন। গল্পের বানুর স্বামী তিনটি শয্যাসঙ্গিনীর উপভোক্তা। তার কাছে স্থায়ী সম্পর্ক বলে কিছু হয় না। মেয়েদেরকে সে ফুর্তির সামগ্রী বলেই

বিশ্বাস করে। মেয়েদের সম্মানের আব্রু-বেব্রু, মুক্তি-মুক্তচিন্তা, পারিশ্রমিক সাম্যতা যে আছে, তাদের যে এটা প্রাপ্য – এ বিষয়ে বানুর স্বামীর মতো স্বার্থপর নারীমাংসখেকোর মানসিকতায় নেই। নারী কেবল ভোগ্যা এবং ভোগের পর বর্জ্য পদার্থের মতো সংসারের কোণে স্তূপাকারে ফেলে রাখা হয়। গল্পের বানু বলে,

> 'আমি তার তৃতীয় স্ত্রী। সে বলে, আমি নাকি তার স্ত্রী হলেও সঙ্গিনী নই।...আমি কখনো পরপুরুষের সঙ্গ করিনি। আমার শরীরকে নিয়ে যা কিছু করার আমার স্বামীই করেছে। তবু সে কখনো আমার একমাত্র শিশু পুত্রটার দিকে একদৃষ্টে দেখে। অবিশ্বাস আমাকে কষ্ট দেয়। কিছু বলি না। শুধু মেয়েদের কাছে নয়, ঈশ্বরের কাছেও পুরুষের বিশ্বাস জিনিষটা ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য।'[১১]

গল্পের বানুর এই নির্মম বেদনার কথা ব্যক্ত করার মতো কি একটি নির্ভেজাল সত্য পুরুষসমাজ নেই? মনকে বিদীর্ণ করার মতো নারীর এই অব্যক্ত মনের ভাষা শোনার জন্য কি এখনো পুরুষ সমাজ তৈরি হয়নি? এই প্রশ্নগুলো গল্পটি পাঠ করার সময় পাঠকের মানস পটে অগোচরে ভেসে ওঠে। কখন যে অজানতে পাঠক গল্পের বানুর মতো নারীদের হয়ে অন্যায়ের প্রতিকার খোঁজার জন্য বিচলিত হয়ে ওঠে তারও খেয়াল থাকে না। যখন একজন পুরুষের কাছে বিশেষ করে শুনতে হয়,

> 'মেয়ে? আর মানুষ? সে (বানুর স্বামী) হো হো করে হাসে। যেন খুব একটা মজার কথা সে এই মাত্র শুনলো।'[১২]

অর্থাৎ মেয়েরা যে মানুষ – সে কথাটিই বানুর স্বামীর মতো পুরুষের কাছে বিশ্বাসের বাইরে। নারীদেরকে যে তাদের উপযুক্ত সম্মানের আসন দিতে হবে তার কোনো বালাই নেই বানুর স্বামীর গড়া এই পুরুষ সমাজে। এই মনগড়া সমাজে পুরুষ যা খুশি করতে পারে, স্বাধীনতা যেন তাদের ইশ্বরদত্ত। যেকোনো সময় তারা শয্যাসঙ্গিনীর সংখ্যা বাড়াতে পারে,

> 'তোমাতে আমাতে ভেদ আকাশ আর পাতাল, আমি তিন কেন, দাসীর সংখ্যা আরো বাড়াতে পারি, তুমি ভোগ্যা, দাসী।...পুরুষ রণাঙ্গণে যায়, শত্রুকে হত্যা করে, তারপর শত্রুর মা-বোন-স্ত্রীকে বলাৎকার করে। স্ত্রীলোক অবধ্য – কারণ ভোগের সামগ্রী বিনাশ না করাই ধর্ম।'[১৩]

লেখক গল্পের ইতি এখানেই টানেনি। নারীদের লাঞ্ছনার শেষ এখানেই নয়। তাদের অপমানের অবহেলার ঘড়া পুরুষ সমাজ অনেক বড়ো করে তৈরি করে রেখেছে। যার জ্বালাময়ী যন্ত্রণার দৃষ্টান্ত লেখক বদ্‌রুজ্জামান দিয়েছেন,

> 'হ্যাঁ মারলাম এবং পারলাম। প্রত্যেক পুরুষই স্ত্রীকে মারে এবং মারতে পারে। এ আমাদের অধিকার। সে (বানুর স্বামী) নির্লজ্জের মতো হাসে। বলে, আমার শরীরে পুরুষের পবিত্র রক্ত।'[১৪]

স্ত্রীকে প্রহার করা, চরমভাবে লাঞ্ছনা করা এবং নিজেদেরকে পবিত্র রক্তের অধিকারী বলে প্রচার করা এসবই এই নির্লজ্জ পুরুষ সমাজের পৌরুষত্বকে নারীদের প্রতি জিইয়ে রাখবার বেহায়া মন্ত্রণা।

পুরুষের আত্মতুষ্টির এই মনগড়া সমাজ, মুখোশধারী পুরুষের এই ভালোত্ব প্রচার - আর যাইহোক এর সজীবতাকে নির্মল সবুজ বলে দাবী করা যায় না। যেখানে বীজধারণকারিণীকে অপয়া বলে সমাজ সংজ্ঞা দিচ্ছে সেখানে সমৃদ্ধির ঘড়া অপূর্ণ থাকে বৈকি!

এই প্রবন্ধে বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরীর ছোটোগল্পের সমীক্ষার ভিত্তিতে আমরা যেক'টি মানুষের যাপনের সত্যমূল্য খুঁজে পেয়েছি তা নিছকই গল্পের উপাদানস্বরূপ হিসেবে নয়। গল্পের জীবন এবং বাস্তবের জীবনের মধ্যে অনেকটা ফারাক থাকলেও বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরীর এই উক্ত গল্পগুলোর ক্ষেত্রে সেই ফারাকের দৈর্ঘ্য অনেকাংশেই ছোটো। লেখক অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী। একাডেমি সমাজতাত্ত্বিক না হয়েও তিনি এমনভাবে সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা পাঠককে চমকে দেয়। এই যে গল্পের নইমুদ্দীন, সয়েফুদ্দীন প্রভৃতি নররূপী শোষক এখনো কোনো না কোনো টেরিটোরির সাধারণ মানুষকে শোষণ করছে, সামান্য অর্থের বিনিময়ে খেটে খাওয়া মানুষদের সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে। অপশাসনের ধারাকে বজিয়ে রাখছে। বানুর স্বামীর মতো পিশাচ নারীদের বেঁচে থাকার

সংজ্ঞা বদলে দিচ্ছে, অল্প বয়সী পারুলকে বিরাশী বছরের রাক্ষসের ভোগ্যা হতে হচ্ছে। এই সব পিশাচদের দল কোনোদিন পঞ্চত্ব পাবে না, এরা চিরকালীন মজ্জাহীন হাড়গোড় নিয়ে সমাজে বেঁচে থাকবে আর দুর্বলদের খুবলে খুবলে ছিঁড়ে খাবে। পরিশেষে একথা না বললেই নয় যে, বদ্‌রুজ্জামানের এই সব গল্পের চরিত্র, প্লট নিছকই সাহিত্যের উপাদান নয়, লেখকের এই সমাজবীক্ষণ একান্তই সত্য এবং চিরন্তন।

তথ্যসূত্র :

১. *'জানোয়ার',* শীলাদিত্য, প্রকাশ, ১৯৭৮, পৃ. ১১
২. *'মানুষ',* অঙ্গীকার, প্রকাশ, ১৯৮২, পৃ. ১৯
৩. তদেব, পৃ. ১৯
৪. তদেব, পৃ. ২০
৫. তদেব, পৃ. ২০
৬. তদেব, পৃ. ২১
৭. পুরকায়স্থ, রমা : *'বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা',* অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর, প্রকাশ, ২০০৫, নভেম্বর, পৃ: ১৪০
৮. *'পরবাস',* বঙ্গশ্রী, প্রকাশ, ১৯৭৯, পৃ. ১৪
৯. তদেব, পৃ. ১৫
১০. *'অশ্লীল',* শ্রীহট্ট জ্যোতি, প্রকাশ, ১৯৮০, পৃ. ১৮
১১. *'আমরা সবাই ভালো আছি',* ডালিম, প্রকাশ, ১৯৮০, পৃ. ২৩
১২. তদেব, পৃ. ২২ - ২৩
১৩. তদেব, পৃ. ২৩
১৪. তদেব, পৃ. ২৪